

শিকারায় বেড়াল

অনিতা দেশাই
অনুবাদ ॥ পম্পা পাল



B
028.5
D 451 S

D 451 S.



***INDIAN INSTITUTE
OF
ADVANCED STUDY
LIBRARY, SHIMLA***

শিকারায় বেড়াল

অনিতা দেশাই

অনুবাদ

পম্পা পাল

ছবি

গীতা ওয়াদেরা

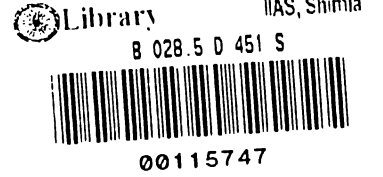
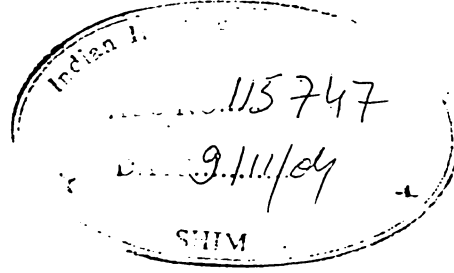


সাহিত্য  অকাদেমি

Sikarai Beral : Bengali translation by Pampa Paul of Anita Desai's Children book
in English *A Cat on the Houseboat*, Sahitya Akademi, New Delhi, 2001. Rs. 35

© সাহিত্য অকাদেমি
ISBN 81-260-1057-6

প্রথম প্রকাশ ২০০১



সাহিত্য অকাদেমি

রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি ১১০ ০০১

বিক্রয় কেন্দ্র : স্বাতী, মন্দির মার্গ, নতুন দিল্লি ১১০ ০০১

জীবনতারা ভবন, ২৩এ/৪৪ এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫৩

গুণ ভবন, ৪৪৩-৪৪৫ আন্না সলাই, তেয়নামপেট, মাদ্রাজ ৬০০ ০১৮

১৭২ মুম্বাই মারাঠি গ্রন্থ সংগ্রহালয় মার্গ, দাদার, মুম্বাই ৪০০ ০১৪

সেন্ট্রাল কলেজ ক্যাম্পাস, ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী বিল্ডিং, ড. বি আর আশ্বৈদকর ভীথি,
বাস্তালোর ৫৬০ ০০১

B
028.5
D451S

মূল্য : ৩৫ টাকা

অক্ষর বিন্যাস :

দি মনিটর, ১৮ রডন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০১৭

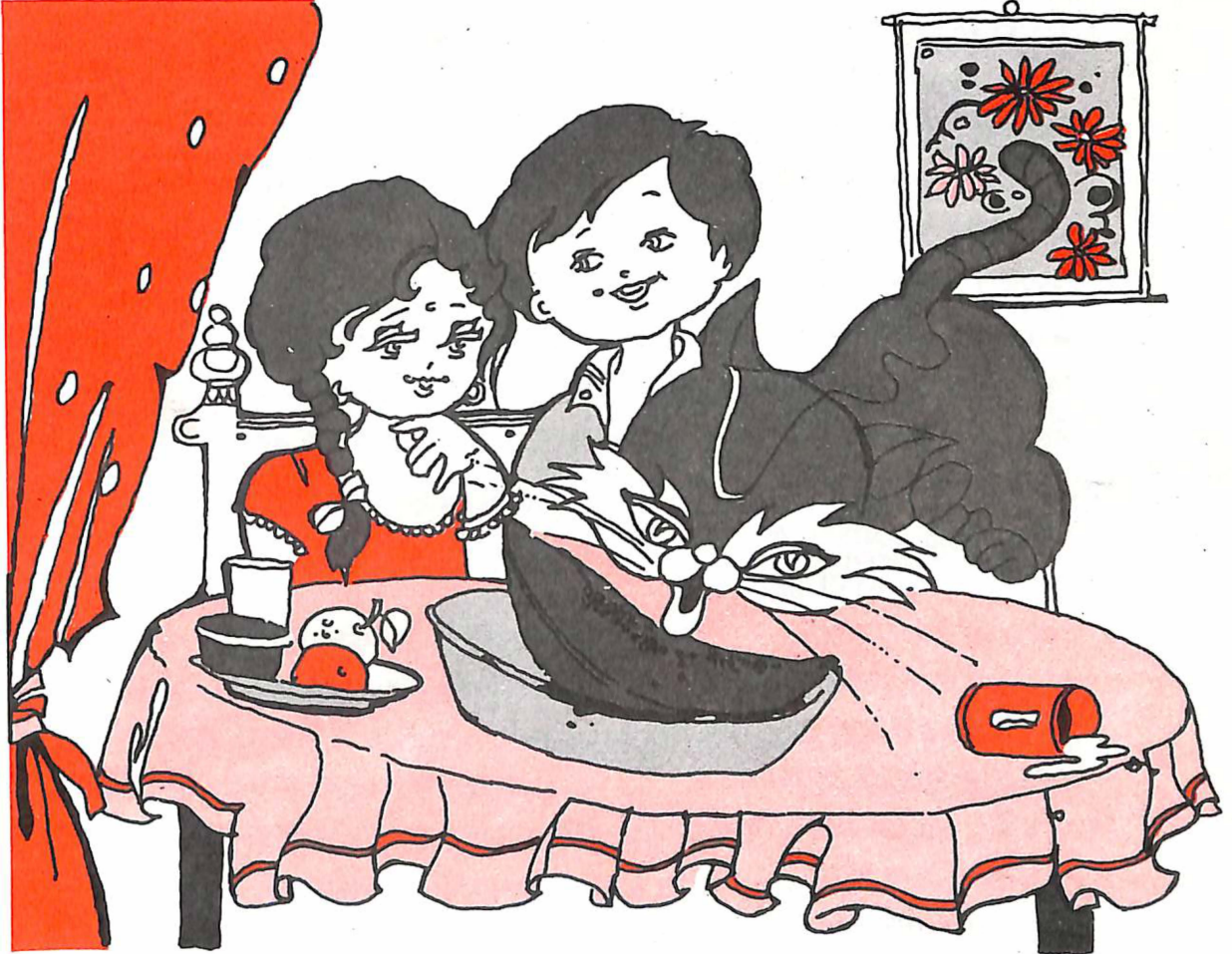
মুদ্রক :

ডি জি অফসেট, ৯৬/এন, মহারাণী ইন্দিরা দেবী রোড, কলকাতা ৭০০ ০৬০

শিকারায় বেড়াল

তোমরা যদি সেই বেড়ালটার সঙ্গে দেখা করতে, তা হলে বুঝতে, তার মধ্যে ছিল অদ্ভুত একটা ব্যাপার। বেড়ালটা পেঁপে খেতে খুব ভালোবাসত, তাই তার আদরের নাম ছিল পেঁপে। তোমরা তো জানো, পেঁপে খেতে যেমন সুস্বাদু, তেমনি সুগন্ধ এর। লেবু আর চিনি দিয়ে খেতে খুব ভালো লাগে। এই গাছের পাতা হয় বড় বড়, ছাদের মতো। আর গরমের দিনেই এর ফলন হয়। বেড়ালটা ছিল দেখতে খুব সুন্দর— সোনালি চোখ, সাদা থাবা, সাদা গৌঁফ আর ধূসর রঙ ছিল তার গায়ের।

ছোটবেলায় একদিন পেঁপে দেখল, খাবার টেবিলের ওপরে চিনামাটির বাটিতে ছোটো-



শিকারায় বেড়াল

ছোটো ফলে টুকরো কেটে রাখা হয়েছে। দেখে খুব লোভ হল তার। এক লাফে টেবিলে উঠে ফলগুলো খেতে লাগল। নরেন আর নীরার অনুমতি পর্যন্ত নিল না। কারণ তখনও সে ভদ্রতাই শেখেনি। যদিও পেঁপে দুজনেরই পোষা বেড়াল। ওই সময়ে হঠাৎ নরেন আর নীরা ওখানে এসে পড়ল। পেঁপেকে অমনভাবে ফল খেতে দেখে তারা অবাক! আরো অবাক হল তাকে পেঁপে গাছে চড়তে দেখে।

তখন থেকেই নরেন ওর নাম রাখল পেঁপে। ভাবল, পুষি থেকে পেঁপে নামটাই ভালো। নীরার নামটা একদম পছন্দ হল না। বলল, 'ইস্! কী বোকা-বোকা নাম!'

নরেন বলল, 'বোকা না, তবে একটু অদ্ভুত ধরনের।' যাই হোক, তাকে পেঁপে বলেই ডাকতে লাগল সবাই।

শুধু তাই নয়, নরেন আর নীরা গরমের ছুটিতে তার অন্য গুণাবলিও টের পেল। জানতে পারল, তিনি বেড়াতে ওস্তাদ। তাই ওদের বাবা পেঁপেকে 'ঘুরন্ত' বলেই ডাকতেন।

এবার গরমের ছুটিতে কাশ্মীর যাওয়া ঠিক হল তাদের।

কিন্তু মা পেঁপেকে নিয়ে মহা চিন্তায় পড়ল।

নরেন বলল, 'কেন, আমাদের পাচক হরি। তার কাছেই নয় রেখে যাব ওকে।'

মা জানাল, 'হরি তো নিজের দেশে যাচ্ছে।'

'তাহলে পেঁপেকে কে দেখবে?'

নীরা ওকে কোলে তুলে বলল, 'তাই তো, কোথায় থাকবি বল তো তুই!'

'আচ্ছা, রামের কাছে রেখে গেলে কেমন হয়?' নরেন বলল।

নীরা রেগে গেল— 'না, পেঁপে রামকে মোটেই পছন্দ করে না। ও সবসময় মাউথঅর্গান বাজায়। আর ওর কুকুরটা, বড্ড শয়তান।'

'তা হলে কী করা যায় এখন?'

কেউ ভেবে পেল না কী করবে।

শেষে মা বলল, 'মনে হচ্ছে, ওকে আমাদের সঙ্গেই নিয়ে যেতে হবে।'

মা নরেন আর নীরার মনের কথাটাই বলেছিল। তাই দুজনকে আর পায় কে। একজন পেঁপেকে আদর করতে ব্যস্ত, আর একজন মাকে।

কিন্তু বাদ সাধলেন ওদের বাবা— 'না, তা কী করে সম্ভব! ওকে আমরা প্লেনে কী করে নিয়ে যাই? তাছাড়া থাকব ডাল লেকে, হাউসবোটে। সেখানে জল-ই-জল। ওরা জল পছন্দ করে না, ভয় পায়।'

'কিন্তু ওকে এখানে একা ফেলে রেখে যাওয়া যায় না।'

তাই পেঁপেও তাদের সঙ্গে কাশ্মীরে গেল।

বেচারি পেঁপে শুধু বন্ধ ঝুড়িতে থাকল না, বরং ঝুড়িটা ধাক্কায় গড়াগড়ি পর্যন্ত খেল। এমনকী এয়ারপোর্টে প্লেনের ভয়াবহ আওয়াজও শুনতে পেল। কখনো প্লেনের উপরে যাওয়া, আবার কখনো নীচে নামাও টের পেল। এর ফলে সে অসুস্থ বোধ করল।

পেঁপে ঝুড়ি থেকে বাইরে বেরোবার আশ্রয় চেপ্টা করছিল। কিন্তু নরেন' আর নীরা তার একটি কথাও শুনল না। উন্টে ধমক দিল।

কে যেন বলল, 'বেরোলেই দুষ্টুমি করবে, ছাড়িস না।'

পেঁপে মোটেই দুষ্টুমি করত না। কিন্তু, কেউ বুঝল না তাকে। আসলে বাইরেটা দেখার জন্য ওর মন ছটফট করছিল। তাই খুব দুঃখ হল তার। চুপটি করে ঝুড়িতেই পড়ে থাকল। ঘন-ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ যেতেই চমকে উঠল। মনে হল, এবার সে কোনো শব্দ জায়গায় নয়, নরম মাটিতে। চারদিকের কোলাহল কানে এল তার। আর অনুভব করল মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়ার। শুনতে পেল নরেন আর নীরার কথাবার্তা।

তারা বলাবলি করছিল, 'দেখ, দেখ ওই ছোটো নৌকাগুলো। কী সুন্দর পর্দা আর গদি আঁটা!'

'ওগুলো শিকারা। জলে চলার ট্যান্ডি, বুঝলি।'

'একটায় শুধু ফুল, দেখ।'

'আরে! আর একটায় তরকারি।'

'আমাদের হাউসবোট কোন্টা?'

'চেনবার চেপ্টা কর। ওই দেখ, আমাদের 'স্টার অফ কাশ্মীর'। মানে কাশ্মীরের তারা।'

'ওই গোলাপি পর্দাওয়ালা? যেখানে ফুলের টব রাখা?'

'মা, দেখো, জলে কত পদ্ম! তুমি এর আগে কখনও এত বড় বড় ফুল দেখেছ?'

পেঁপেকে আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। তাকে ঝুড়ি থেকে বের করা হল।

তখন তার রাগ দেখার মতন।

নীরা ওকে আদর করে কোলে তুলে বলল, 'ভালো আছিস তো?'

মা ওকে বলল, 'কোলে তুলিস না, ছেড়ে দে।'

পেঁপে দেখল, সুন্দর একটা কাঠের তৈরি ঘরের মধ্যে সে। জানালায় গোলাপি পর্দা হাওয়ায় দুলছে আর চারদিকে উইলোগাছ (ওখানকার লোকেরা ওই গাছকে 'মজানু' বলে), ছাদে ফুলের টব, মেঝেতে কার্পেট, ঘরে গদিওয়ালা সোফা, ক্যালেন্ডার, ফুলদানি আর কাঠের কারুকার্য করা নানারকম জিনিসপত্র। তাছাড়া টেবিলে পত্র-পত্রিকার ছড়াছড়ি। খুব

সুন্দর আর আরামদায়ক।

পেঁপে তো অবাক! ভাবল— ‘এ-সবের কী দরকার?’

তারপর সবার সঙ্গে খাবার ঘরে ঢুকে দেখল, নতুন কাজের লোকেরা টেবিলে প্লেট সাজাতে ব্যস্ত। এই ঘরটা বেশ সুন্দর। জানালায় সবুজ পর্দা। টেবিলে আবার ফল আর মিষ্টির বাটি। তাই দেখে পেঁপে খিদের চোটে নীরার পায়ের কাছে ততক্ষণ বসে থাকল যতক্ষণ না তাকে চিনেমাটির প্লেটে মাংস আর পাউরুটি দেওয়া হল। বাড়িতে সে টিনের থালায় খেত। বাড়ির সেদ্ধ মাংস আর কাঁটামাছের থেকে এখানকার খাবার শতগুণে ভালো।

তাই পেঁপে গপাগপ সব সাটিয়ে ফেলল। নীরা ওর গৌঁফে মাংসের বোল লাগা দেখে তো হেসেই লুটোপুটি।

পেঁপের ইচ্ছে করছিল কাউকে না বলেই বাগানে মাটি খুঁড়তে যাওয়ার। কিন্তু একা যেতে পারল না। তাই সে এক লাফে জানালায় উঠে বসল। ওখানে ঠাণ্ডায় জড়োসড়ো হয়ে গেল। বাইরের দৃশ্য দেখে হতভম্ব। লোম খাড়া হয়ে উঠল তার। চক্ষু চড়কগাছ।

চারদিকে জল আর জল। জলের ঢেউ বরফের চাদরের মতো পরিবেশকে আরও সুন্দর করে তুলেছিল। ওর মনে হল, জলেই ডুবে যাবে।

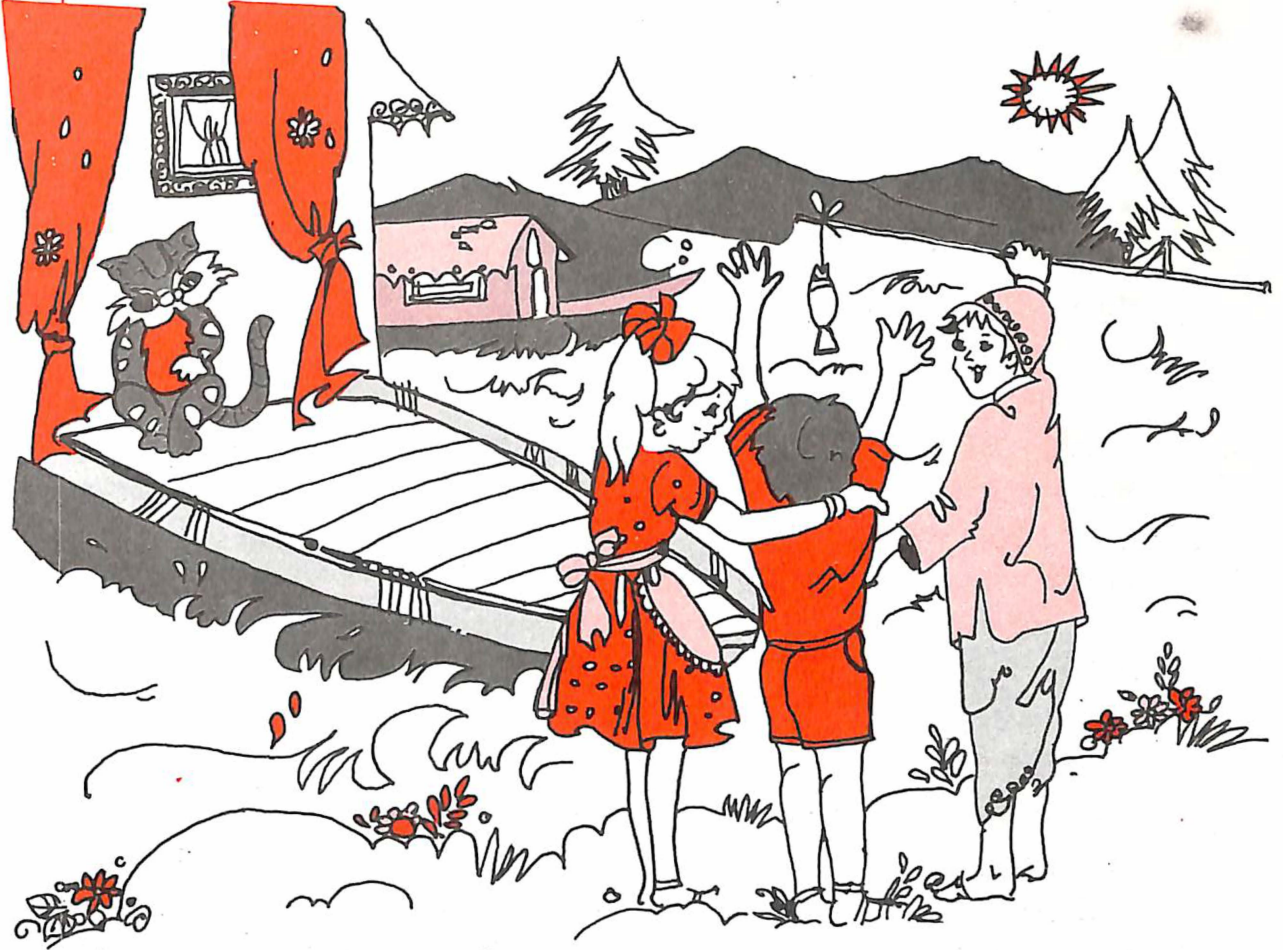
অত জল দেখে ভয়ে পেঁপে ঘরে পালিয়ে এল। তারপর আলমারির পেছনে লুকোবার চেষ্টা করল। বারবার ওর মনে হল, সবাই যেন চক্রান্ত করে ওকে জলে ফাঁসিয়েছে।

নীরার মা আদর করে ডাকল। পেঁপে রেগে গিয়ে তার হাত কামড়ে দিল। তা সত্ত্বেও মা আদর করে কোলে তুলে নিল ওকে। কারণ মা জানত যে ও মাটি খুঁড়তে চায়। তাই নিয়ে এল জানালার কাছে। পেঁপে ভয়ে অস্থির। ভাবল— ‘এই বুঝি জলে পড়ে গেলাম।’ তাই চিৎকার-টেঁচামেচি জুড়ে দিল।

কিন্তু মা জলে না নেমে খুব সাবধানে কাঠের তক্তায় পা রাখল। কাঠের তক্তাটা ছিল হাউসবোট আর মাটির মাঝামাঝি। ছোটো একটা দ্বীপ ছিল সেখানে। চারদিকে লেকের গাছ। এরকম গাছ সে আগেও দেখেছে। মা পেঁপেকে কোল থেকে নামাল। তখনও রাগ থামেনি ওর। কারণ এত ভেজা মাটি তার একেবারে পছন্দ না। তাই অস্বস্তিতে এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগল। ভাবল, যা হয় মঙ্গলের জন্যই হয়।

ওই দ্বীপেই ওদের হাউসবোট ‘স্টার অফ কাশ্মীর’ বাঁধা ছিল। অন্য ধারে তিন-তিনটে চিনারের বড়-বড় গাছ। পেঁপের জানতে দেরি হল না যে এখানেও তাদের শহরের মতো কোলাহল। তাছাড়া জমজমাটও বটে। তাই কাঠের তক্তায় দৌড়ে এসে ভয়ে-ভয়ে চারদিকে আঁকুপাঁকু করে ঘুরতে লাগল। তবে অল্পদিনেই সেখানে তার মন বসে গেল।

আবদুল করিমের জন্যই ওই দ্বীপে ভিড়। ‘স্টার অফ কাশ্মীর’-এর সঙ্গে বাঁধা হাউসবোটেই সে সপরিবারে থাকত। হাউসবোটটা খুব ছোটো, অবশ্য খালি। তাছাড়া পর্দা বা ফুলের টবও



ছিল না কোনোখানে। দেওয়ালে ছিল না কোনো ছবি। তা সত্ত্বেও আবদুল করিম ওখানেই থাকত। নীরা আর নরেনের মা'র সব কাজ, এমনকী রান্নাবান্নাও, করে দিত তার বউ। নৌকার মাচায় তাদের রান্নাঘর ছিল। সেখানেই মাটির উনুনে কাঠ জ্বেলে রাখা হত। বাসন রাখার জন্য ছিল কাঠের তত্তল আর কাঠের চামচ রাখা হত পিনের মতো চকচকে পেরেকে।

আবদুল করিমের তিন ছেলে। বড় ছেলে আলি, হাউসবোটেই কাজ করত। খুব শান্ত ছেলে। সে পেঁপেকে ভালোবাসত আর অনেক কিছু খেতে দিত বলে পেঁপেও তাকে ভালোবাসত। কিন্তু প্রথমদিন পেঁপে আলিকে কলতলায় জামা-কাপড় ছেড়ে হঠাৎ জলে ঝাঁপ দিতে দেখে বেশ ভয় পেয়েছিল। ভাবল, ও বুঝি জলে ডুবে গেছে। তাই সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। কিন্তু জলের বাইরে আলির মাথা দেখে শেষ পর্যন্ত পেঁপের ধড়ে প্রাণ এল।

কে যেন হঠাৎ ওকে ডাকল, 'আলি, আলি!'

শিকারায় বেড়াল

পেঁপে পেছন ফিরে দেখল, বাচ্চা কোলে একটা ফর্সা টুকটুকে মেয়ে ওর দিকে এগিয়ে এসে লেকের পাড়ে বসে পড়ল। তারপর বাচ্চাটাকে জলে চোবাতেই ছুঁফট করে উঠল সে। পেঁপের আবার ভয় পাবার পালা। ওর মনে হল, মেয়েটি জলে কোনো খেলা দেখাচ্ছে। একবার বাচ্চার মাথায় জল ঢালে আর একবার নিজের মাথায়। তখন বাচ্চার চিৎকার শুনে লম্বা, সুন্দর একটা বউ হাতে পরিষ্কার জামা নিয়ে বেরিয়ে এল। তারপর জামাটা পরিয়ে বাচ্চাটাকে আদর করতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাচ্চাটা বউটার কাঁধের উপর ঘুমিয়ে পড়ল।

পেঁপের মনে হল, এরা জলই ভালোবাসে। তা না হলে কি আর মেয়েটা অমনভাবে জলে ঝাঁপ দিয়ে আবার আলিকে ডাকাডাকি করে?

পেঁপে তো ভয়ে জড়োসড়ো। কিন্তু মেয়েটি জল থেকে বেরিয়ে ওকে দেখতে পেয়েই লজ্জায় ঘরে এক ছুট। তারপর নিজের মাকে বাইরে ডেকে কী যেন বলল নিজেদের ভাষায়। ওদের পছন্দ হল না তার, ফলে আদৌ কিছু বোঝার চেষ্টা করল না পেঁপে। তাই মুখ ঘুরিয়ে নিজের হাউসবোটে চলে গেল।

মেয়েটাও এল ওর পেছন-পেছন হাউসবোটের জানালায়। নীরা ওকে দেখতে পেয়ে একমুঠো চেরি দিল। তারপর পেঁপেকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। ওকে দেখে মেয়েটা তাড়াতাড়ি হাত দুটো পেছনে করে নিল। তাতে ওর বয়েই গেছে, পান্ডাই দিল না মেয়েটাকে।

সেদিনই নীরারা পেঁপেকে ‘গুড বাই’ করে কিলফিশার শিকারায় বেড়াতে গেল। ও ছাদে বসেছিল। খুব খারাপ লাগছিল একা থাকতে। দেখল, আলিও ছোটো বোট নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। এরপর ও কাঠের তক্তায় নেমে এসে ভাবল, একবার এই দ্বীপটা না হয় ঘুরেই দেখি।

ঘুরতে-ঘুরতে কুকবোটে এসেই ঘাবড়ে গেল। জলে একটা পাখি। তার দুটো পা-ই দড়ি দিয়ে বাঁধা। ভাবল, এখানকার পাখিরাও বুঝি জল ভালোবাসে। মুর্গি বোধহয়। কিন্তু না, এর তো ছোটো ঠোঁটের বদলে কমলা রঙের চ্যাপটা ঠোঁট। আবার পঁয়াক-পঁয়াক করছে। মনে হচ্ছে সাঁতার কাটছে পায়ে, তবে জল ভালোবাসে না তাই বাঁধন খোলার আশ্রয় চেষ্টা। তাই ওর কাছে গিয়ে পেঁপে জিজ্ঞাসা করল, ‘কে তুমি? তোমাকে এমনভাবে কে বেঁধে রেখেছে?’

পাখিটা ওকে দেখে ভয়ে জলে দাপাতে লাগল, ফলে টান পড়ল তার পায়ে।

পেঁপে ওকে আশ্বাস দিয়ে বলল, ‘ভয় পেও না, আমি তোমাকে খাব না। তোমার এমন অবস্থা, আমার খারাপ লাগছে।’

পাখিটা বুঝল, বেড়ালটা ওর বন্ধু। তাই তার কাছে সে নিজের দুঃখ প্রকাশ করল। সে জঙ্গলে থাকত। আর পোকামাকড় ধরে খেত। বলল, ‘একদিন একটা বড় ছেলে আমাকে

ধরে এখানে নিয়ে আসে আর বেঁধে রাখে। জানি না, এখানে আর কত দিন বাঁধা থাকবে। মনে হয় খেয়েই ফেলবে একদিন। জানো, যখনই একটু নড়াচড়া করি, পায়ে খুব যন্ত্রণা হয়।' একথা বলতে বলতেই পাখিটা দুঃখে কেঁদে ফেলল।

'আচ্ছা কী করি বলো তো, তুমি কি দড়িটা কেটে ফেলতে পারবে?'

পেঁপে বলল, 'না, এখন কিছু করা সম্ভব নয়। কারণ তোমার দড়িটা গভীর জলে। তাছাড়া ভিজ়েও। তবে এখানে বেশ কিছুদিন আছি। তোমাকে ছাড়াবার কোনো-না-কোনো একটা উপায় অবশ্যই বের করব। হ্যাঁ, ভালো কথা, তুমি খেতে-টেতে পাও তো?'

হাঁসটা ওর কথা শুনে ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, 'দেখছনা, দড়িটা কী ছোটো। বেশিদূর এগোতে পারি না। সামনে যা পাই, তাই খাই। পোকামাকড়, এমনকী জলের ঘাস পর্যন্ত।'

হঠাৎ কথার মাঝখানে পেঁপে দেখল, জলে কী যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। খুব অবাক হয়ে হাঁসটার দিকে চেয়ে থাকল।

হাঁসটা বলল, 'ওগুলো মাছ। দেখো, কেমন সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে চারদিকে।'

পেঁপে মাছেদের দেখে আনন্দে আত্মহারা। এর কারণ, এত দিন সে বাজার থেকে আনা বরফ-দেওয়া মরা মাছই খেয়েছে। তাই হাঁসটাকে বলল, 'তুমি কি ওদের ধরতে পারবে?'

'দেখছি তুমিও আমার মতো মাছ খেতে ভালোবাসো', বলেই হাঁসটা হেসে ফেলল।

এরপর পেঁপে নরম মাটি আঁচড়ে জলে ফেলতে লাগল। ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে তো আরও অবাক। ভাবল, ইস্! যদি এদের খেতে পারতাম!

হাঁস পেঁপের মনের অবস্থা বুঝে বলল, 'দেখছি তুমি মাছের বড্ড বেশি ভক্ত।'

পেঁপের তৎক্ষণাৎ জবাব— 'খু... উ... ব...!'

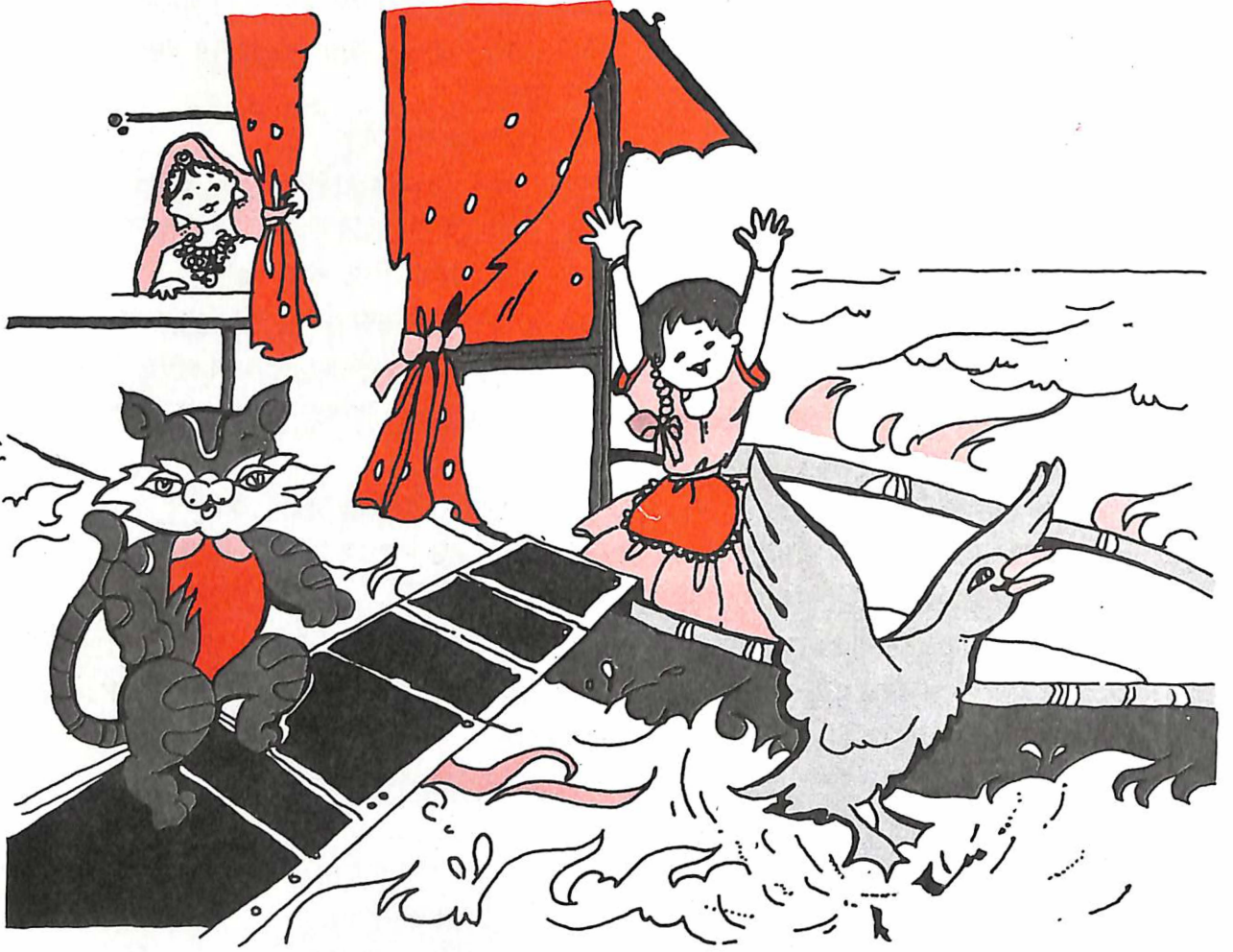
হাঁস বলল, 'আচ্ছা শোনো, আড়ালে তোমাকে মাছ ধরে খেতে দেব। কী, খুশি তো?'

ঠিক ওই সময়ে ওরা দেখতে পেল, একটা নৌকা এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ মাঝির বউটা জানালা দিয়ে ধুপ্ করে জল ফেলল। মাথায় জল পড়তেই পেঁপে নিজেই কোনোমতে বাঁচাল। অথচ হাঁসটা ভিজ়ে দাপাতে লাগল।

ওখানকার নৌকাগুলো ছিল সাজানো আর ঘরগুলো ছোটো-ছোটো। ঘরে যা গরম। গরমের চোটে পেঁপের ঘুম এল না, অথচ সবাই ঘুমে বিভোর। অভ্যেসমতো নীরার খাটের পাশে ঠায় বসে থাকল। তবুও গরম যায় না। মেঝেয় পাতা গালিচায় পর্যন্ত শোয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। হাওয়াও পেল না সেখানে। তাই কাঠের মেঝেতে নামল। সেখানেও একই অবস্থা। শেষ পর্যন্ত জানালায় উঠে বসল। বেশ আরামদায়ক জায়গাটা। হাওয়াও পাচ্ছিল সে। তাই ওখানে বসে থেকে হাউসবোটের দিকে চেয়ে থাকল।

কিন্তু ওখানেও সে নিস্তার পেল না বাইরের চাঁচামেচির হাত থেকে। জায়গাটাকে বাজারের মতো মনে হল ওর। চাঁচামেচি শুনে মনেই হচ্ছিল না যে এরা এত সুন্দর একটা



জায়গায় থাকে। এখানকার লেকে পদ্ম ফোটে। চারদিকে হাঁসদের আনাগোনা। এরা জলে পোকামাকড় ধরেও খাচ্ছে আবার বোট থেকে ফেলা জিনিসগুলোও ঠোকরাচ্ছে। পেঁপে সবকিছুই লক্ষ করছিল। ওই হাঁসগুলো ছিল নানা রঙের। কেউ-বা উজ্জ্বল কমলা রঙের আবার কেউ ধূসর ও সবুজ। ওদের সাঁতার কাটতে দেখে পেঁপে ভাবল, ওরা বুঝি রাতেও ঘুমায় না।

হঠাৎ একটা মূর্গির আওয়াজে পেঁপের টনক নড়ল। খিঁচিয়ে উঠল তার মুখ।

পাশের হাউসবোটের লোকেরা 'স্টার অফ কাশ্মীর'-এর মতো এত শান্ত ছিল না। কেউ জোরে-জোরে রেডিও শুনছে। এক জায়গায় খুব আলো। সেখানে কেউ-বা খাবার তৈরি করতে ব্যস্ত। খুব চঁচামেচি। পাশেই একটি বুড়ো জোরে-জোরে হঁকো টানছে। আর একটি

বউ বাসন মাজছে। আর মাঝেমাঝেই বউটা খেপে গিয়ে বুড়োটার ওপর রাগারাগি করে চিৎকার করছে। এছাড়া জলে ফোটা পদ্ম ফুলের মতো সুন্দরী আরো তিনটে মেয়েকে দেখতে পেল বটে তবে তারা যেভাবে ঝগড়া করছিল নিজেদের মধ্যে, মনে হচ্ছিল কোনো কুকুর যেন বেপাড়ায় ঢুকেছে।

বেশ খানিকক্ষণ পর বউটা চিৎকার থামিয়ে বাসন ধোয়ার সময় যেভাবে চারদিকে জল ছিটিয়ে ফেলছিল তা দেখে হাঁসগুলো ভয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল। তক্ষুনি একটা শিকারা এসে পেঁপেদের বোটকে ধাক্কা দিল। ও দেখল, কুকবোট থেকে আলি বেরিয়ে আসছে।

পেঁপে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল। তক্ষুনি किसের যেন আওয়াজ শুনতে পেল। জলে একবার উঁকি-ঝুঁকি মেরে আকাশের দিকে চেয়ে দেখল। বেশ মেঘ জমেছে, বড়-বড় ফোঁটাও পড়তে লাগল। সে এক লাফে জানালা থেকে নীরার খাটের পাশে গুটিসুটি হয়ে বসে পড়ল। ভাবল, না, ওই ঠাণ্ডায় ওখানে বেশিক্ষণ বসে থাকা মোটেই উচিত হয়নি।

পরদিন নরেন আর নীরা ভালো করে ব্রেকফাস্ট পর্যন্ত করল না। আসলে মন ছিল কই? দুজনেই একমুঠো করে চেরি আর আলুচে পকেটে পুরে আলির শিকারার দিকে চলে গেল। মা বাধা দিল না। ওদের ওঠার পর বোটটাকে ঠেলে দিল জলে। নরেন হঠাৎ আলির হাত থেকে দাঁড় টেনে নিয়ে বোটটা চালাবার চেষ্টা করল, পারল তো না-ই, বরং একটা তরকারিওয়ালার বোটের সঙ্গে ধাক্কা খেতে যাচ্ছিল। তরকারিওয়ালারা কোনোমতে নিজের বোটটাকে বাঁচাল। আলি নরেনকে দাঁড় টানা শেখাল। তারপর তারা এগিয়ে গেল। তখন নরেনের কী চিৎকার— ‘দেখ, দেখ, আমি নৌকা চালাতে পারি!’

নরেন আর নীরাকে আলির সঙ্গে একা যেতে দেখে পেঁপে বেশ ভাবনায় পড়ল। ওকে বিশ্বাস করতে পারল না। ভাবল, ও যদি ওদের জলে ফেলে দেয়। তারপর ছাদে পিটুনিয়া টবের পাশে বসে ওদের ফিরে আসার অপেক্ষা করতে লাগল। তক্ষুনি দেখল, ফুল-শাক-সবজি, আলু-পেঁয়াজ ভর্তি একটি শিকারা। মা ওই শিকারা থেকে তরিতরকারি কিনছিল।

তারপর নীরা আর নরেনকে চিৎকার করে হাত নাড়তে-নাড়তে এগিয়ে আসতে দেখল। শিকারা এদিক-ওদিক দুলাছিল। অবশ্য আলিই পাড় পর্যন্ত শিকারাটাকে টেনে আনল। পেঁপে ওদের নামতে দেখে তাড়াতাড়ি তক্তার থেকে নীচে নেমে এল।

‘আলি, আগে আমাকে— নীরা কী যেন ওকে বিড়বিড় করে বলল।

‘না, না। আগে আমাকে— নরেন বলল।

আলি শিকারাটা পাড়ে বেঁধেই উইলোগাছে উঠে পড়ল। পেঁপের কিছুই বোধগম্য হল না। দেখল, আলি অনেক উপরে উঠে গেছে। ওই গাছের পাতাগুলো সোনালি আর স্লেট রঙের। সে গাছের ডাল কেটে নীচে ফেলতে লাগল। নরেন আর নীরা সেগুলো কুড়োবার জন্য হড়োহড়ি করে ছুটে গেল। ততক্ষণে জোহরাও একটি নাদুস-নুদুস বাচ্চা কোলে বেরিয়ে

এল আলিকে দেখতে।

গাছ থেকে নেমে নিজের পকেট থেকে একটা ধারালো ছুরি, সাদা রিল আর কতকগুলো চকচকে হুক বের করল। সেগুলো ওর সঙ্গেই ছিল মনে হয়। আলি জলের ধারে বসে ওগুলো নিয়ে কী সব করতে লাগল। বাচ্চারা ওকে চারিদিকে ঘিরে ফেলল। ততক্ষণে আলির একটা মাছ ধরার বঁড়শি তৈরি করা হয়ে গেছে।

জোহরাকে মাখা আটা আনতে বলল। ওই আটা দিয়ে মাছ ধরার জন্য ছোটো-ছোটো গুলি তৈরি করে হুকের সঙ্গে আটকে দিল। নরেন আর নীরা দড়ি ধরে এক টান দিতেই জল থেকে কী যেন বেরিয়ে এল। প্রথমটা পেঁপে বুঝল বুঝি ঘাস। কিন্তু না, সেগুলো মাছই। মাছেদের যে এরকমভাবে ধরা যায়, তা পেঁপের আগে জানা ছিল না।

মাছ ছোটো-বড়ো সব ধরনেরই ছিল। কোনোটা বাচ্চাদের আঙুলের মতো, কোনোটা আবার আলির হাতের মতো লম্বা। নরেন আর নীরা নেশায় রোজ সকালে অমন মাছ ধরত আর জোহরার নিয়ে আসা জল-ভর্তি টিনের মধ্যে ছেড়ে দিত।

নীরা পেঁপেকে মাছ খাওয়ার জন্য ডেকে নিয়ে এল কাঠের তক্তায়। কিন্তু মাছেদের ছটফট করতে দেখে ভয় পেল। গন্ধটা বেশ লাগছিল ওর। তবে মাছেদের ছটফটানি না-কমা পর্যন্ত প্লেট থেকে তুলে খেল না। ভাবল, যদি নাকে ছিটে আসে, তা হলে! মাছগুলো খেতে ছিল দারুণ। আগে এত ভালো মাছ কখনোই খায়নি পেঁপে। এমন শয়তান, খেয়ে-দেয়ে নীরার জামায় গৌঁফটা মুছে রাখল।

আলিও বড়ো মাছ ধরেছিল নিজের পরিবারের জন্যে।

সেদিন দুপুরে পেঁপে লেকে বাঁধা হাঁসটার কাছে গেল। বলল, 'তোমার কী সৌভাগ্য! এখানে বাঁধা রয়েছ। লেকের কত মাছ ধরে খেতে পারো!'

'কী করে তা সম্ভব! আমি তো খুব জল ছেটাই। তাই পোকামাকড় আর মাছেরা আমার থেকে দূরেই থাকে। এমনকী দড়িটাও ছোটো, বেশি দূর এগোতে পর্যন্ত পারি না।'

পেঁপের ভেবে খুব খারাপ লাগল যে ও এত ভালো খাবার খেল, কিন্তু হাঁসটার কিছুই জুটল না।

'বিশ্বাস করো, তোমাকে আমি এখান থেকে ছাড়াবোই।'

এমন সময় কুকবোটের জানালা খুলে জোহরা পেঁপেকে জলের ধারে বসে থাকতে দেখে চিৎকার করল। কারণ, সে এমনটি কখনও দেখেনি। পেঁপে ওর চিৎকার শুনেই পগার পার নিজের হাউসবোটের দিকে। বিরক্তিতে বলল, 'মেয়েটা তো বড্ড পাজি! আমাকে সবসময় চোখে-চোখে রাখে!'

ওখানকার জীবন বেশ ভালোই লাগছিল ওর। কারণ নরেন আর নীরা মাছ ধরে ওকে খেতে দিত। আরামসে মাছগুলো খেয়ে নীরার জামায় গৌঁফটা মুছে দিত।



সবাই বেরিয়ে গেলে প্রথম-প্রথম পেঁপের একা থাকতে খুব ভয় লাগত। কিন্তু ফিরে এসে নীরা ওকে কোলে তুলে আদর করতে-করতে বলত, 'জানিস, কত জায়গায় ঘুরলাম। শালিমার বাগ, সুন্দর-সুন্দর ফোয়ারা, কত ফুল দেখলাম। এর আগে কখনো এমনটি দেখিনি। পশমের কারখানায়ও গেলাম। এই দেখ, তোর জন্য কত পোকামাকড় ধরে এনেছি।'

পেঁপের তখন ভালোই সময় কাটত। লেকে গিয়ে বাঁধা হাঁসটার সঙ্গে গল্প করত, কখনও ছাদে চলে যেত। সেখানে আইরিস আর জিরেনিয়াম ফুলের টবের মাঝখানে লুকিয়ে লেক দেখত।

লেকে একধরনের পাখি উড়ে যায়। ওগুলো কী পাখি? কখনো পাখিরা হাউসবোটে আবার কখনো চিনারগাছে গিয়ে বসত। ওরা মাঠের পাখিদের মতো বড়ো-বড়ো নয়। এখানকার বাচ্চাদের মতো তারাও জল দেখে ভয় পেত না। লেক থেকে ঠোঁট দিয়ে টুক করে মাছ তুলে একেবারে উইলোগাছে উড়ে বসত।

শিকারায় বেড়াল

পাখিদের উড়তে দেখে পেঁপের বড় হিংসে হত। ভাবত, ও যদি পাখি হত, তা হলে সব মাছ ওর কপালেই জুটত। সেখানে ছিল নানারকম পাখি— কালো, সাদা, লেজ-কাটা আবার লম্বা কামানের মতনও। মাছ খেত এমনভাবে, মনে হত যেন আইসক্রিম খাচ্ছে। পেঁপের দিকে একবারটিও তাকাবার প্রয়োজনবোধ করত না।

গোলাপফুলের টব লাগানো এমন অনেক শিকারা যাত্রীদের নিয়ে আসা-যাওয়া করত। তাদের হাতে থাকত ব্যাগ, ঝুড়ি, ক্যামেরা— আরো কত কিছু। যাত্রীরা যেমন ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করত, তেমন দ্বীপের মাটিতে লাগানো শাক-সবজি ও টমেটো গাছগুলো ঘুরে-ঘুরে দেখত।

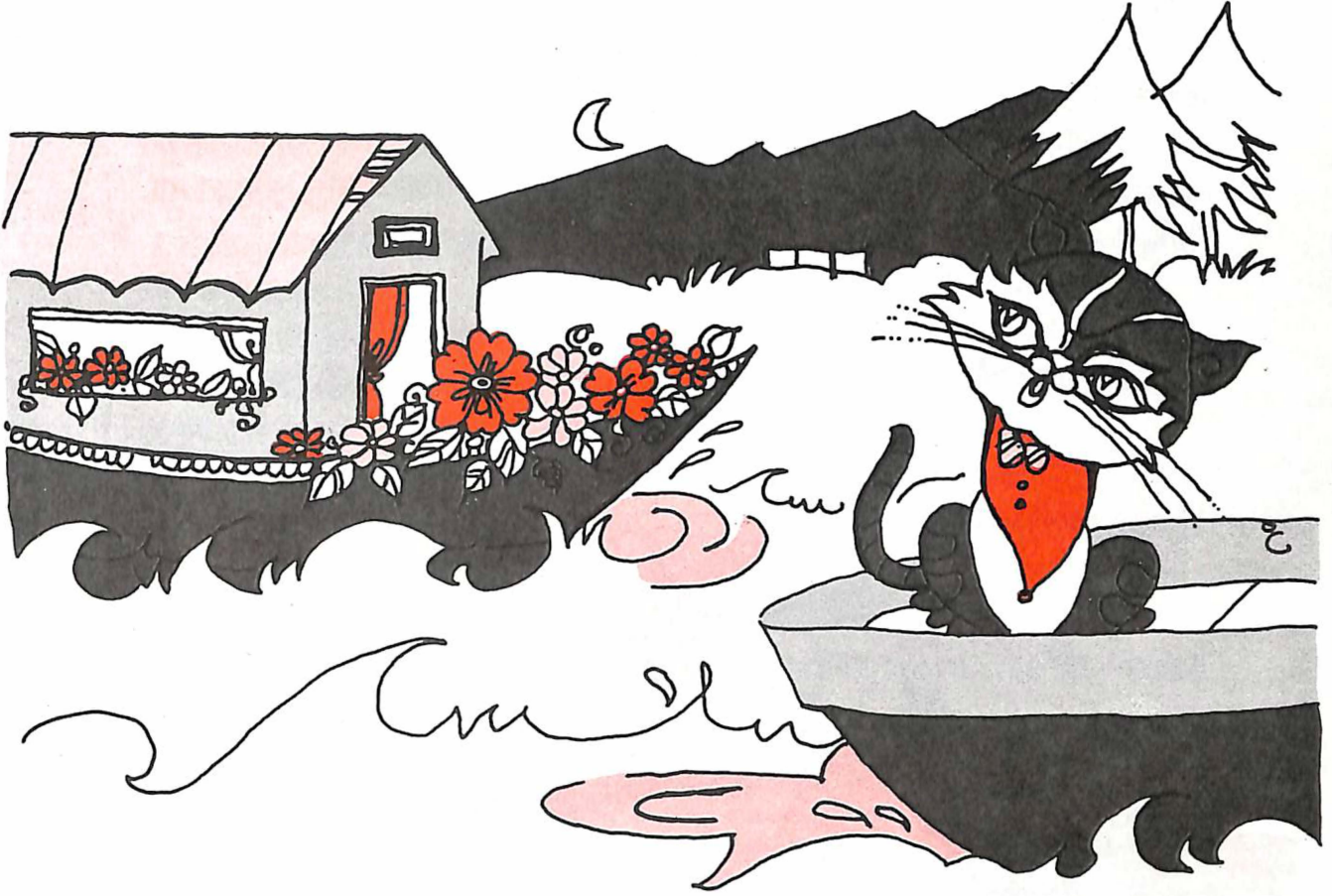
ওখানে ব্যবসায়ীদের শিকারায় লোকজনের বেশি আনাগোনা। ব্যবসায়ীরা নিজেদের শিকারায় রাখা মালপত্র এক হাউসবোট থেকে অন্য হাউসবোটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত। জিনিসপত্রের মধ্যে সূক্ষ্ম কাজ করা কাশ্মীরি শাল তো ছিলই, তাছাড়া সুন্দর-সুন্দর গালিচারও অভাব ছিল না। সেগুলো কেনার জন্য খরিদদারদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। গালিচাগুলো নানা রঙের— কোনোটা লাল, বেগুনি, আবার সেকালের ইরানি নকশার মতো। তার মধ্যে আগেকার আমলের রাজা-মহারাজাদের বড়-বড় ঘরের মাপের। তাছাড়া কোনো-কোনো গালিচা ছোটো, একজনের বসে নামাজ পড়ার জন্য আবার কোনোটা পশমের তৈরি কোট-টুপি এবং হাতের দস্তানাও ছিল। আখরোট কাঠের তৈরি কৌটো, ট্রে আ বাচ্চাদের খেলনাও দেখা গেল। এই সমস্ত জিনিস নসি ও ক্রিম রঙের রাংতা দিয়ে মোড়া। অদ্ভুত সুন্দর চকচকে পালিশ করা।

এতগুলো শিকারার মধ্যে পেঁপের কিন্তু ফুলের শিকারাগুলোই বেশি পছন্দ হল। দেখে মনে হচ্ছিল, লেকে ফুলের বাগান। সেখানে শুধু এক ধরনের নয়, নানা ধরনের ফুল ছিল। কোনোটা লম্বা ডাঁটির গ্লাডিওলাই ফোক্সের তোড়া, গোলাপি আর হলুদ রঙের গোলাপের থোকা, সাদা আর আইরিস রঙের সুগন্ধী পিটুনিয়া। পেঁপের কাছে এই দৃশ্য আরও মনোরম হয়ে ওঠে, যখন নৌকাগুলো একে-একে মাছ ধরতে যায়।

এর মধ্যে চিঠিপত্র দিয়ে ভরা নৌকাটি বেশ অদ্ভুত লাগল। লোকেরা এখানে চিঠিপত্র কিনছিল। পোস্টম্যান গদির ওপর আরামসে বসে দেখছিল কেউ টিকিট কিনবে কি না।

সে আরও দেখল, ওখানকার বাচ্চারা জলে কীভাবে নির্ভয়ে লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছে, ঠিক যেন মাছ। ওরা দাঁড় টেনে জলে এদিক-ওদিক ভাসছিল। পেঁপে আদৌ কিছু না বুঝে নিজের মাথা নাড়িয়ে গেল।

একদিন পেঁপে ফুলের টবের মাঝখানে শুয়ে-শুয়ে লোক দেখছিল। সেখানে কত লোকের আনাগোনা। তারা মিষ্টি সুরে কী যেন বলছে পরস্পরকে। দেখল, কতকগুলো লোক বড়ো হাউসবোটটাকে ঝিলের মাঝখানে টেনে নিয়ে এসে হাউসবোটের চারদিকে ঘুর-ঘুর করছে।



পেঁপে এরকম ধবধবে সাদা, গোলাপ দিয়ে মোড়া অদ্ভুত হাউসবোট আগে কখনো দেখেনি। শুধু তাই নয়, জানালাগুলো আবার গোলাপি জিরেনিয়াম ফুল দিয়ে সাজানো। ছাদে গোলাপি আর সাদা কাপড়ের ঝালর। পেঁপে দেখল, ওই হাউসবোটটা ক্রমশই ওদের হাউসবোটের দিকে এগিয়ে আসছে। তাই ধাক্কা লাগার ভয়ে, সাবধানে, চুপটি করে ভয়ে টবের পেছনে লুকিয়ে থাকল। কিন্তু না, তা হল না। ওর মনে হল, পেঁপেদের নতুন প্রতিবেশী।

পেঁপে দেখল, লোকগুলো সারা দুপুর চাঁচিয়ে জ্বালিয়ে খেল। বিকেলে বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব ছিল। একে অপরকে মালপত্র ঠিক মতো গুছিয়ে রাখার জন্য বলছিল।

হঠাৎ পেঁপের লেজ খাড়া হয়ে উঠল পাশের বোটটার দিকে তাকিয়ে। দেখল, একটা বেড়াল। কিন্তু ওর চোখদুটো সবুজরঙের। গৌফজোড়া পুরু, ঘন মসৃণ লেজ। এরকম বেড়াল সে আগে কখনো দেখেনি। ওর সামনে নিজেকে খুব ছোটো মনে হল, তাই মাথা

শিকারায় বেড়াল

হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকল।

একটু সঙ্কোচ কাটানোর পর বেড়ালটাকে জিজ্ঞাসা করল— ‘আচ্ছা, তুমি কি এই হাউসবোটেই থাকো?’

বেড়ালটা একটু তচ্ছিল্যের সুরে বলল— ‘হ্যাঁ, গরমকালে এখানে চলে আসি। এখানে কী যে করি! আজকাল দিল্লিতেও খুব গরম। তাছাড়া বোম্বের আবহাওয়াও সুবিধের নয়, বৃষ্টি, শুধু বৃষ্টি।’

‘তুমি বুঝি খুব ঘোরো?’

লেকের দিকে তাকিয়ে উদাস সুরে বলল— ‘হ্যাঁ, প্রায়ই।’

‘তুমি তো কাশ্মীরি বেড়াল নও?’



পেঁপের কথা শুনে বেড়ালটা একটু মুচকি হাসল। পেঁপে খুব লজ্জা পেয়ে মাথাটা নীচু করে নিল।

বেড়ালটা বলল, ‘যদিও আমি পার্শিয়ান বংশের। তবে মোঘলরা কাশ্মীর জিতেছিল বলে তুমি আমাকে কাশ্মীরিও বলতে পারো। কথা বলার সময় বেড়ালটা বেশ গর্ববোধ করছিল বলে মনে হল। আসলে গরমে এখানে থাকতে বেশ লাগে। খাবারদাবারের কোনো অসুবিধা নেই, বলতে পারো। দুপুরে যেমন তাজা মাছ আর রাতে ভাজা। খাবারগুলো যা সুস্বাদু, কী বলব তোমাকে!’

পেঁপে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, ‘সত্যি! যা বলেছ।’

বেড়ালটা জানাল— আগে সে নগিন লেকে ছিল। সুন্দর অথচ ফাঁকা। এখানে কোলাহলটা বেশি তাই চলে এসেছে। অবশ্য বরফ দেখার জন্য গুলমার্গেও যেতে পারে।

‘জানো, আমি কোনোদিন বরফ দেখিনি। ওই জায়গাটা বুঝি খুব সুন্দর?’

‘হ্যাঁ, আমরা পহেলগাঁওয়ে গিয়ে ট্রাউট মাছ ধরব। খেতে খুব ভালোবাসি। তোমরা যাচ্ছে না?’— সাদা বেড়ালটা বলল।

পেঁপের জবাব— ‘ঠিক বলতে পারছি না, জানো।’

ডাল লেকে বেশ কাটছিল পেঁপের। কিন্তু সাদা বেড়ালটার কথা শুনে মনে হল, কাশ্মীরে এর থেকেও ভালো জায়গা আছে।

পেঁপে ওকে ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করল— ‘কেন, এখানে তোমার ভালো লাগছে না?’

সাদা বেড়ালটা কোনো ভ্রক্ষেপ না করেই লেকের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘এরা তো ব্যবসায়ী। দেখছ না, কিভাবে এক নৌকা থেকে অন্য নৌকায় মাল বয়ে নিয়ে চলেছে।’ পেঁপে আরও জানতে পারল— শ্রীনগরে বিখ্যাত জায়গা শালিমার ও নিশাত বাগ। ওই জায়গাটি মোঘল বাদশাহদের তৈরি। সাদা বেড়ালটা বলল, ‘দেখ, কী সুন্দর চিনারগাছের ফাঁকে-ফাঁকে ফোয়ারা। তুমি কি কখনো গেছ ওখানে?’

‘না, কখনও না’— পেঁপে আপন মনেই বিড়বিড় করল।

‘আচ্ছা চলি। দেখি গিয়ে চাকরবাকররা কী করছে। যা নজর রাখতে হয় ওদের ওপরে।’

এই বলে সাদা বেড়ালটা গোঁফজোড়া তুলে, লেজ দুলিয়ে ওখান থেকে চলে গেল।

‘আরে, আরে! তোমার নামটাই তো জানা হল না।’

‘আমার নাম— পাশা সুলেমান আবদুল রজ্জাক’ বলেই ওখান থেকে উধাও হয়ে গেল সাদা বেড়ালটা।

পেঁপে ওর কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। তাই সারা দুপুর ছাদেই বসে থাকল। যতক্ষণ না নীরা ওকে খাবারের জন্য ডাকল।

আরে! এখনও এখানে বসে আছি। কী দেখছি, নৌকোটাকে? সুন্দর না? মনে হচ্ছে

শিকারায় বেড়াল

একটা বড় সাদা কেক যেন। ওটার নাম ‘মোঘল এম্পারার’। নামটাও কী সুন্দর না!

পেঁপে নীরাকে সাদা বেড়ালটার কথা বলতে চাইল, কিন্তু পারল না। এর আগেই নীরা ওকে কোলে তুলে মাছের প্লেটের কাছে নিয়ে এল। প্লেটে মাছ ছিল, কিন্তু ওগুলো ট্রাউট মাছ নয় বরং ঝিলের ছোটো-ছোটো মাছ। কিন্তু আজ পেঁপে মাছের তেমন স্বাদ পেল না। ওই রাতেই নতুন কিছু অনুভব করে মাথা ঘুরতে লাগল তার।

এমনিতেই সে সবসময় ঝিলের সম্পর্কে উৎসুক। সেদিন নরেন আর নীরার ঘরের জানালার হাওয়া খাওয়ার জন্য শুতে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনই কাদের যেন চাপাস্বরে কথা বলা শুনতে পেল আর দ্বীপের সঙ্গে বাঁধা একটা শিকারা জানালা দিয়ে দেখতে পেল। কী আশ্চর্য! ওখানেও আর একটা বেড়াল। একেবারে কালো কুচকুচে।

‘শোনো, শোনো, এখানে বসে আমি তোমাকেই দেখছি আর ভাবছি, জলে কখন পড়বে তুমি!’ হঠাৎ গিটারের তারের মতো কথাগুলো বন-বন করে উঠল। পেঁপে প্রচণ্ড রেগে গেল ওর ওপর।

তারপর কালো বেড়ালটার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল, ‘আমি এই হাউসবোটেই থাকি। জলে পড়তে যাব কোন্ দুঃখে?’

‘আরে! দেখছি তুমিও এই জগৎ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।’ বলেই কালো বেড়ালটা অযথা হেসেই লুটোপুটি।

‘না, আমি চারদিকে টো-টো করে ঘুরে বেড়াই না, বুঝলে।’

‘ও, ঘরকুনো বুঝি! জানো, আমি কত জায়গা ঘুরেছি। এখানে বড্ড একা লাগে।’

‘তোমার ঘোরা তোমার পরিবারের ওপরেই নির্ভর করে, বুঝলে।’ পেঁপে কথাগুলো হঠাৎ কোনো ভদ্রমহিলার মতো ওর দিকে ছুঁড়ে দিল।

‘আরে, শোনোই না, আমি কোথায়-কোথায় ঘুরেছি। নিউইয়র্ক, শিকাগো, পশ্চিমে জঙ্গলের ধারের শহরগুলোতে। যুরোপেও গেছি। রোমে ছিলাম কিছুদিন, অনেক বেড়ালের সঙ্গেই আমার দেখা হয়েছে। একদম আমার মতো’— বলেই সে মুচকি হাসল। ‘প্যারিসেও ছিলাম। জায়গাটা ভারি সুন্দর। ওখানে দুজন বন্ধুও পেয়েছিলাম। খুম ভালো ছিল তারা, সত্যি!’

পেঁপে কালো বেড়ালটার কথা শুনছিল বটে, কিন্তু ওর ব্যবহার একেবারে পছন্দ হচ্ছিল না। তবু ও ওর ঘুরে বেড়াবার অভিজ্ঞতাটা জানতে চাইল।

‘আমি তো কখনও এক জায়গায় টিকে থাকতে পারি না’— কালো বেড়ালটা কথাগুলো জোরে জোরে চিৎকার করে বলতে লাগল। ‘জানো, আমার সঙ্গে আরো দুজন বেড়ালের ভাব হয়েছিল। ওরা এথেন্সের নৌকার প্রতীক্ষায় ছিল। আর জানো, আমি ভারতবর্ষের কথা অনেক শুনেছি। এখানে নাকি অনেক সাপ আর গাঁজা পাওয়া যায়। কিন্তু কই, কখনো

সাপও দেখতে পেল না। তাছাড়া গাঁজা-আফিমের কথা তো দূরে থাক, খাইওনি। তবে ভেবে নিয়েছিলাম এখানে আসবোই।’

কথাগুলো শুনতে-শুনতে পেঁপে কেমন যেন কুঁকড়ে গেল। লেজ খাড়া হয়ে গেল। ‘তাহলে এখানে কি তুমি সাপ দেখেছ? আর গাঁজা, তাও খেয়েছ নাকি।’

কালো বেড়ালটা পেঁপের সরলতা দেখে হেসেই খুন। ‘না— না—। আমার মনে হয়, এসব বাজে কথা। কী বল?’

পেঁপে তার গল্প শোনার জন্য আঁকুপাঁকু করছিল, তখনই দেখল মোঘল এম্পারারের দরজাটা খুলে কে যেন রাগী-স্বরে বলল, ‘একদম চিৎকার-চেষ্টামেচি নয়, চুপ করো।’

শিকারায় ঠাণ্ডা জলের একটা মগ হঠাৎ উল্টে গেল। কালো বেড়ালটা চটজলদি ওখান থেকে চলে গেল। আর পেঁপেও লেজ তুলে দৌড় দিল নিজের শিকারায়।

বেশ ভিজে গিয়েছিল পেঁপে। ইচ্ছে করলে সে জানালায় গিয়ে আবার বসতে পারত। ওর খুব জানতে ইচ্ছা করছিল কালো বেড়ালটার অনুভূতিগুলো। কিন্তু বেড়ালটা তো চলে গেল। শিকারাটা একদম ফাঁকা, শান্ত। পেঁপে ওর প্রশ্ন শুনে খেপে গিয়েছিল বটে, তবে পরে ওর কথা ভেবে খুব আফসোস হল। তাই দুঃখে এক কোণায় গুটিয়ে পড়ে রইল।

পরদিন পেঁপে পাশার হাউসবোটে গেল রোদ পোহাতে। দেখল, পাশাও সেখানে। পাশা জানাল, ও রাতে একটা কালো বেড়ালের চেষ্টামেচিতে ঘুমোতে পারেনি। শেষে জলভর্তি বালতি ফেলে দিতেই বেড়ালটা পালিয়ে যায়।

পেঁপে পাশার কথা শুনে তুতলে গিয়ে বলল— ‘আচ্ছা, ওখানে তো আ... মি... ই...।’

‘আহ! তাহলে তুমিও ওর কথাগুলো শুনছিলে, সারা রাত?’

‘না, না। আমি কেন হতে যাব’— বলেই পেঁপে মুখ ঘোরাল।

কালো বেড়ালটা খারাপ না। বেশ মজার-মজার কথা বলে। স্বভাবটাও মন্দ নয়। ওই তো... পাশা পেঁপের প্রতিবেশী। খুব বন্ধুত্বও হয়ে গিয়েছিল ওদের মধ্যে। তাই একদিন পাশা নিজের নৌকায় আসার আমন্ত্রণ জানাল পেঁপেকে।

‘তুমি সত্যি যেতে বলছ? আমি নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু ওখানে অন্য লোকদের দেখে আমি খুব ভয় পাই।’

পাশা বলল— ‘তা হলে দিনে এসো না, রাতে এসো। ছাদে গল্প করব আর এখানকার দৃশ্য উপভোগ করব।’

পেঁপে নীরবে মাথা নীচু করে লেজ নাড়তে লাগল। কী জবাব দেবে তা ভেবেই পেল না।

সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর পেঁপে আস্তে-আস্তে কাঠের তক্তায় পা রাখল। তারপর ভিজে মাটিতে এমনভাবে গেল যাতে কোনো আওয়াজ না হয়। খুব লজ্জা পেল পেঁপে, কারণ

শিকারায় বেড়াল

এর আগে ও কখনো সাদা বেড়ালটার কাছে আসেনি। তাই অল্প আওয়াজেই সে ভয় পেল।
‘আরে! এত রাতে তুমি কী করছ এখানে?’

এ আর কেউ নয়, সেই বাঁধা হাঁসটা জলে সাঁতার কাটতে-কাটতে জিজ্ঞাসা করল।

পেঁপের অবশ্য হাঁসটার সঙ্গে কথা বলার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। তাই বলল, ‘চুপ, সবাই জেগে যাবে।’

‘আমি কাউকে জাগাবো না বুঝলে, তোমার কোনো চিন্তার কারণ নেই। আমি কাউকে কিছু বলব না।’

পেঁপে ‘মোঘল এম্পারার’-এর কাঠের তত্তায় গেল। পাশা অপেক্ষাই করছিল। কাছে যেতেই পেঁপে দেখল— সাদা বেড়ালটা তো অনেক বড়। গায়ে খুব লোম, দেখতে কী সুন্দর! অবশ্য দূর থেকে এতটা বোঝাই যায় না। ওর চকচকে সবুজ চোখ দেখে পেঁপে একেবারে গলে গেল।

‘চলো, তোমাকে আগে ঘরগুলো দেখিয়ে দিই’— পাশা বলল। তারপর ও একটি ঘর থেকে আর এক ঘরে নিয়ে গেল। ঘরগুলো দেখতে খুব সুন্দর। মেঝেতে পাতা ছিল গালিচা, তার ওপর গোলাপফুল আঁকা। পেঁপে দেখল, একটা লম্বা হুকো যার সারা গায়ে পুঁতির কাজ করা। দেওয়ালে মোঘল বাদশাহ ও তাদের বেগমদের ছবি তো ছিলই, তাছাড়া বড় বড় ফুলদানিগুলোও সুন্দর।

পেঁপে এমনভাবে সব জিনিস দেখছিল যেন ওর কত ভালো লেগেছে। কিন্তু তা আদৌ সত্যি নয়। ওর সব থেকে ভালো লেগেছিল সবুজ সুন্দর চোখওয়ালা পাশাকে।

তারপর পাশা পেঁপেকে ছাদে নিয়ে এল। পূর্ণিমার রাত লেকের দৃশ্যকে আরও অদ্ভুত করে তুলেছিল। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদের আলো যেন আরও জ্বলজ্বল করছে। পেঁপে লেকে হাউসবোটের কালো ছায়া দেখতে পেল। আর উইলোগাছের কালো ছায়া জলে এসে পড়েছিল। চারদিকে গোলাপি পদ্মের সুবাস ছড়িয়ে। কখনো কখনো দু-একটা শিকারাও আসা-যাওয়া করছিল সেখানে।

পূর্ণিমার রাতটি ছিল পেঁপের জীবনে সব থেকে সুখের আর সুন্দর রাত। দুজনেই পূর্ণিমা রাতের আলো উপভোগ করছিল। পাশার উজ্জ্বল সবুজ চোখদুটো বেশ লাগছিল ওর। তাছাড়া পাশার মিষ্টি গলায় গানও সত্যি অপূর্ব!

‘শালিমারে হল তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব

বন্ধু বলো এখন তুমি কোথায়

বন্ধুত্ব থাকবে সারা জীবন মনের কোণায়।’

পাশা পেঁপের উদ্দেশে জোরে-জোরে গান গাইল। পেঁপে গান শুনে আনন্দে আত্মহারা। বিশ্বাস করতে পারল না যে এ গান ওর মতো একটা সাধারণ বেড়ালের জন্য গাওয়া

হয়েছে। অদ্ভুত শব্দ ছিল গানের। তাও আবার কাশ্মীরের বেড়াল পূর্ণিমার রাতে ওর জন্য গাইছিল।

তারপর একদিন পাশা চলে গেল। রাতে পেঁপে কেঁদে-কেঁদে আকুল। পাশা ওকে বলেছিল, ‘এবার তারা ট্রাউট মাছ ধরতে পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে। কারণ ঝিলে বড্ড ভিড় আর গরমও বটে।’

‘তুমি চলে গেলে আমি কিন্তু তোমাকে ছাড়া একা থাকতে পারব না’— পেঁপে পাশাকে বলেছিল। ‘তা হলে এটাই কি আমাদের শেষ দেখা?’

‘আহা! বোঝো না কেন? এটাই তো জীবন। আমরা জাহাজের মতো আসা-যাওয়া করি। পথের পথিক আমরা। একদিন না একদিন এ জীবন ছেড়ে চলে যেতেই হবে। তুমিও এ-কথা নিশ্চয়ই জানো।’ তবু পেঁপে ওর কথাগুলো মেনে নিতে পারছিল না।

পরের দিন ডাল লেকে জল পুঁতির মতো চিক-চিক করছিল। চারদিন নিস্তন্ধ। শুধু দেখা



শিকারায় বেড়াল

গেল কিছু জেলেদের, যারা শিকারায় মাছ ধরতে যাচ্ছিল। ‘মোঘল এম্পারার’-এর থেকে মালপত্র নামিয়ে তারা গদিওয়াল শিকারা করে চলে গেল। পেঁপে ওদের যেতে দেখে দুঃখে ফেটে পড়ল। ঠিক সেইসময় ও দেখতে পেল এক মহিলাকে, যার খোঁপায় ছিল ফুল আর আঙুলে অনেকগুলো আংটি।

সে পাশাকে কোলে নিয়ে ওই শিকারায় উঠে পড়ল। মহিলাটি পাশাকে নিজের শাড়ির আঁচলে শুইয়ে দিল। মনে হল, পাশা বেড়াল নয়, একটা খেলনা। আশ্চর্য! ওই বেড়ালটার সঙ্গেই পেঁপে কত রাত গল্প করে কাটিয়ে দিয়েছিল।

শেষবারের মতো পেঁপে পাশাকে আবার দেখল। ওর মনে হল, পাশা যেন ওকে গুডবাই করে চলেছে। ‘গুড বাই পেঁপে, গুড বাই।’ ক্রমশ নৌকাটা পেঁপের চোখের আড়ালে চলে গেল।

পেঁপের অদ্ভুত লাগছিল। পরের দিন নীরা জানাল— ‘জানিস, আমাদের ছুটি প্রায় শেষ। এবার আমরা গরমদেশ মৈদানি এলাকায় চলে যাব।’

পেঁপে নীরবে নীরার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকল।

ওরকম চাহনি! দেখে মাকে ডেকে বলল— ‘আচ্ছা মা, পেঁপে কি আদৌ আমার কথা বুঝেছে?’

জায়গাটা ছাড়তে হবে শুনে পেঁপের খুব কষ্ট হচ্ছিল, আরো কষ্ট হল হাঁসটার কথা ভেবে। ও ওকে কথা দিয়েছিল পায়ের দড়িটা খুলে দেবেই। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তা পারল না, কারণ পাশার সঙ্গে বন্ধুত্বে এমন মেতে ছিল যে এই কাজটা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিল।

তাই ও নীরার কোল থেকে এক লাফে কাঠের তক্তায় মে-আঁউ, মে-আঁউ করে দৌড়ে গেল।

সবাই তখন ব্রেকফাস্টে আড্ডু আর চেরি খেতে ব্যস্ত। পেঁপের তো অমন কাণ্ড দেখে সবাই হতভম্ব।

নীরা ওর মে-আঁউ, মে-আঁউ ডাক শুনে নিজেও ছুটল কাঠের তক্তায়।

নীরাকে দেখেই পেঁপে এগিয়ে এল। তারপর কী যেন বলল— ‘মে-আঁউ, মে-আঁউ’ করে। মা ওর কাণ্ডকারখানায় হেসেই খুন। বলল, ‘দেখ, মনে হচ্ছে যেন নিজের ছেলে ফেলে এসেছে। কিন্তু ও হে! ছেলেটি কোথায়?’

পেঁপে নীরাকে ওই হাঁসটার কাছে নিয়ে এল। দেখল, হাঁসটা জলে সাঁতার কাটছে, পা-টা তখনও দড়ি দিয়ে বাঁধা। পেঁপে ভেবে পেল না, কী করে নীরাকে বোঝায় এরকমভাবে ওকে বেঁধে রাখা যে কত বড় অন্যায়।

এদিকে নীরা হাঁসটার সঙ্গে খেলা জুড়ে দিয়েছে। কখনও গায়ে জল ঢালে, কখনও ঘাস। তখন পেঁপের মাথায় হাত। কিন্তু অন্যদিকে, জোহরাই যেন সমস্যার সমাধান করে দিল।

কুকবোটে জোহরা কোলের বাচ্চাটাকে ফুম পাড়াবার চেষ্টা করছিল। আর ওর মা কফি বানাতে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু নীরাকে দেখেই জোহরা জানালার কাছে এসে ওকে আপাদমস্তক দেখল। তারপর হঠাৎ হাঁসটার দড়ি ধরে দিল এক টান। হাঁসটা পাখনা মেলে ছটফট করতে-করতে পালিয়ে যাওয়ার আশ্রয় চেষ্টা করল। কিন্তু জোহরা নির্মমভাবে দড়িটা নিজের দিকে টেনে উল্টে লটকে দিল বেচারী হাঁসটাকে।

অবশ্য জোহরার আসল উদ্দেশ্য ছিল নীরার কাছে নিজেকে জাহির করা।

নীরা একদম সহ্য করতে পারল না জোহরাকে— চিৎকার করে বলল, ‘লজ্জা করে না, ছেড়ে দাও ওকে। তোমাকে যদি উল্টে বুলিয়ে দি। কেমন লাগবে?’

জোহরা নির্লজ্জের মতো হাসতে লাগল। তবুও হাঁসটাকে ছাড়ল না। হাঁসটা তখনও উল্টে আছে। পাখনাগুলো ঝাপটাতে-ঝাপটাতে সে একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। আর চেষ্টা না। নীরা আর পেঁপের চুপ থাকা সত্ত্বেও জোহরা বুঝতে পেরেছিল, ওরা আসলে কী চায়। তাই খুব চালাকি করে নীরাকে ইশারা করল।

নীরা জিজ্ঞাসা করল, ‘কী চাও বলো তো?’

জোহরা নিজের নোংরা খোঁপায় হাত বুলিয়ে নীরার ফিতের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকল।

নীরা জোহরার মতলবখানা বেশ ভালোভাবে বুঝতে পারল। বলল, ‘ফিতে তুমি একটা শর্তে পাবে, হাঁসটাকে যদি ছেড়ে দাও।’

জোহরা তখন আহ্লাদে আটখানা।

নীরা ফিতে খুলে জানালায় ছুঁড়ে দিতেই জোহরা সেগুলো নিজের জিনিস মনে করে খপাৎ করে তুলে নিল। তারপর মা-র সঙ্গে হাসি-ঠাট্টায় মেতে উঠল।

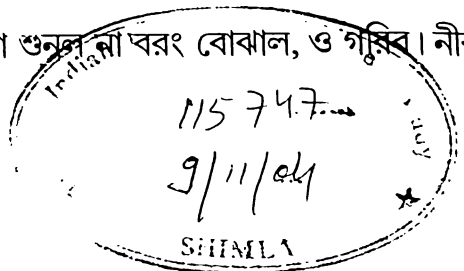
নীরা চেষ্টা করে উঠল, ‘এবার ওকে ছেড়ে দাও’, বলেই হাঁসটার দড়ি কাটতে এগিয়ে গেল, কিন্তু হাঁসটা এমনভাবে পাখনা ঝাপটাল যে নীরা আর পেঁপে জলে ভিজে একশা।

‘জোহরা’— নীরা চেষ্টা করে, ‘দয়া করে ওকে ছেড়ে দাও।’

জোহরা নীরার দুর্বলতা টের পেয়েই ওর প্লাস্টিক ক্রিপের দিকে চেয়ে থাকল।

‘ক্রিপগুলো দিলে হাঁসটাকে ছেড়ে দেবে তো এবার’— বলেই নীরা ক্রিপ দুটো জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিল। জোহরা ওগুলো লুফে নিয়ে হাঁসটাকে মুক্ত করল। অথচ হাঁসটা বিশ্বাস করতে পারল না যে ও আর বন্দী নয়। তাই জলেই চারদিকে ঘুরপাক খেতে লাগল। হাঁসের ওই অবস্থা দেখে নীরা কতগুলো ঘাস ছুঁড়ে দিল জলে। হাঁসটা সেগুলো ধরার জন্য পাখনা ঝাপটাতে-ঝাপটাতে এগিয়ে চলল। ও তখন মাছেদের কাছে, সুদূর বিলের গাছের ছায়ায় আর পদ্মফুলের মধ্যে অনায়াসে এগিয়ে চলল।

মা জোহরার সম্পর্কে নীরার কোনো নালিশ শুনল না। বরং বোঝাল, ও গুঁষি। নীরার



শিকারায় বেড়াল

মতো যখন যা চায় তা পায় না। কিন্তু এ-কথা সত্যি। জোহরার হাঁসটার প্রতি নির্দয় হওয়া একেবারেই উচিত ছিল না।

কয়েকদিন পর, এক কুয়াশাচ্ছন্ন দুপুরে তাদের মালপত্র বেঁধে আলির শিকারায় তোলা হল। আর পেছনের বোটে তোলা হল আখরোটে ভর্তি ঝুড়ি। উলের গালিচা আর রুপোর জিনিসপত্র। এবার তাদের বাড়ি ফেরার পালা। এপারে এসে তারা একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা এগিয়ে চলল এয়ারপোর্টের দিকে।

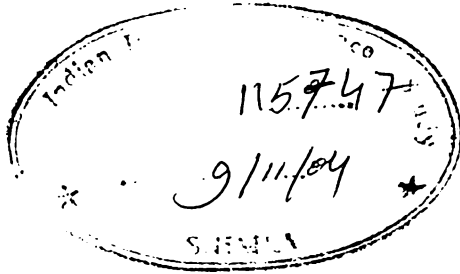
পেঁপের আবার সেই আগেকার মতো করুণ অবস্থা। এবারও তাকে বন্ধ ঝুড়িতে যাত্রা করতে হল নীরাদের সঙ্গে।

খুব রাগ হচ্ছিল পেঁপের, কিন্তু ওর কোনো কিছু করার উপায় ছিল না। তাই চুপটি করে বসে থাকল আর চোখের সামনে ফুটে উঠল সেই সুন্দর লেকের স্মৃতি।

নীরা ওকে মিষ্টি কথায় ভোলাবার চেষ্টা করছিল। বলছিল, 'ভাববার কী আছে। দেখ না, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বাড়ি পৌঁছে যাব। ওখানে গিয়ে তোর প্রিয় খাদ্য পেঁপে খেতে পারবি। দেখ, কত বড় পাকা মিষ্টি পেঁপে। কী খুশি তো?'

কিন্তু নীরা কি জানত, পেঁপে খাওয়ার কথা ভাবছিল না। সে ভাবছিল জীবনে আর কোনোদিন যা ফিরে আসবে না— এই দিনগুলোর কথা।

কেউ কি কখনও বুঝবে পেঁপের দুঃখ!



I. I. A. S. LIBRARY

Acc. No.

This book was issued from the library on the date last stamped. It is due back within one month of its date of issue, if not recalled earlier.

--	--	--	--

CP&SHPS—519-I.I.A.S./2004-25-6-2004-20000.

এক যে ছিল বেড়াল। তার সোনালি চোখ, সাদা থাৰা। সাদা গৌঁফ; ধূসর গা।
পেঁপে খেতে সে ভালোবাসত তাই তার নাম পেঁপে।

নরেন আর নীরা দুই ভাইবোন। একবার ওরা বাবামায়ের সঙ্গে বেড়াতে
গেল কাশ্মীৰে। পেঁপেও গেল। আর সেখানে গিয়ে পেঁপে কত কী দেখল,
জানল। পাশা সুলেমান আবদুল রজ্জাক নামে পাৰ্শিয়ান এক বেড়ালের সঙ্গে
তার আলাপ হয়েছিল।

আর তারও আগে পেঁপে দেখতে পেয়েছিল জলে একটা পাখি। দড়িতে
বাঁধা তার দুটো পা। পেঁপের খুব খারাপ লেগেছিল। তারপর কী করেছিল
পেঁপে সেই সোনালি চোখ, সাদা থাৰা বেড়াল। জানতে হলে পড়তে হবে এই
বই। আজই, এখনই।

অনিতা দেশাই (জ. ১৯৩৭) মূলত গল্প, উপন্যাস লিখে থাকেন। ছোটোদের
জন্য লেখা তাঁর অন্য বইটি হল 'দি পীকক গার্ডেন'। পেয়েছেন সাহিত্য
অকাদেমি পুরস্কার (১৯৭৮) 'ফায়ার অন দি মাউন্টেন' উপন্যাস লিখে।

পম্পা পাল নিজেও লিখে থাকেন গল্প-কবিতা বাংলায়, হিন্দিতে। ইতিপূৰ্বে
অনুবাদ করেছেন শীৰ্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র প্রমুখের রচনা।



ISBN : 81-260-1057-6

মূল্য : ৩৫ টাকা

